لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

মধ্যপ্রাচ্য সংকট সমাধানের দিক নির্দেশনা

হযরত মির্যা তাহের আহমদ

নিখিল–বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা

প্রকাশনায় ঃ
প্রকাশনা বিভাগ,
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বক্‌শী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১

২৪-৮-৯০ তারিখের মূল খুৎবা ঃ হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদক ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ, সদর মুরব্বী

প্রথম প্রকাশ ঃ (পুস্তিকাকারে) ৫,০০০ কপি
জমাদিউল আউয়াল, ১৪১১
অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭
ডিসেম্বর, ১৯৯০

মুদ্রণে ঃ আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস
৪, বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Madhya Prachya Sankat Samadhaner
Dik Nirdeshana
Based on a Friday sermon
delivered on 24-8-90 at the Fazal Mosque, London by:
Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih Rabe (atba)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট সমাধানের দিক নির্দেশনা

দোয়া ব্যাতিরেকে আজ পৃথিবীর ও মুসলিম জগতের ব্যাধি নিরাময়ের অন্য কোন উপায় নেই। প্রত্যেক ধরণের তাক্ওয়াবিহীন কৌশল ও চাতুর্য অবশ্যই পরিণামে নিষ্ফল হবে, যে পর্যন্ত পাশ্চাত্য-বাসী মূল কারণসমূহের প্রতিকার ও নিরসন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে।

মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির দীর্ঘ অধ্যায়ঃ

গত কয়েক শতাব্দী ধরে মধ্যপ্রাচ্যের অঞ্চলটি ক্রমাগত পতনের দিকে যাচ্ছে, বরং যুদ্ধ, আতঙ্ক, অশান্তি ও এহেন বহু-বিধ দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত। বিশেষ করে গত ৪০ বছর ধরে এই সকল দুঃখ-কষ্ট ও আতঙ্ক শুধু যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয় বরং ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এর কারণসমূহ জানা এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু সেই কারণসমূহ জানা সত্বেও প্রাচ্যবাসীরা সেদিকে তেমন দৃষ্টি দেয় নি। পাশ্চাত্যবাসীরাও না। প্রকৃত ঘটনা এই যে, গত চল্লিশ বছর ধরে যত বারই এই

অঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে যার ফলে বিশ্ব-শান্তি সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, তার ফলে ততবারই যে প্রতিক্রিয়া পাশ্চাত্য দেখিয়েছে তাতে আবারও ঐ ধরণের সংকট সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। তাদের ভূমিকা সংকট নিরসনের পক্ষে ছিল না বরং সংকটকে বাড়ানোর প্রক্রিয়া ছিল মাত্র। প্রতিবারের ঐরূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম কালে মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী মুসলমান আরবগণও যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তা ঐরূপই ছিল। যার কারণে পূর্বে তারা বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছিল এবং বার বার নিজেদের দুঃখ-কষ্টকে বাড়িয়ে তুলছিল। অতএব, উপর্যোপরি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে বার বার একই ধরণের ফলাফলে উপনীত হওয়া যা পূর্বের ন্যায়ই ভ্রান্ত সাব্যস্ত হয়েছিল, বিজ্ঞোচিত ছিল না। অথচ উভয় পক্ষেই চিন্তাশীল ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মওজুদ ছিলেন। সুতরাং আসল কারণ ছিল অন্য কিছু, যার দরুন এই পরিস্থিতি সমাধানের পরিবর্তে ক্রমাগত জটিলতর হয়ে চলেছে। সার কথা এই যে, এই যাবতীয় অশান্তির মূলে রয়েছে ইসরাঈল। যদিও প্রত্যেক যুদ্ধের পর পাশ্চাত্য তার একটা বিশ্লেষণ পেশ করে এই অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, মধ্যপ্রাচ্যবাসীদের কি ভুল ছিল এবং তাদের নেতাদের কি ত্রুটি ছিল ? যার ফলশ্রুতিতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু কখনই তারা ব্যাধির মূল কারণ ধরতে পারে নি। এ ব্যাপারে নিজেদের কর্মপন্থার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশগুলি পরিস্থিতির সংশোধনের দিকে কখনো মনোযোগ দেয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জেনারেল নাসেরের উপর ইতিপূর্বে এই অপবাদ দেয়া হোত যে, আব্দুল নাসের একটা পাগল, সে তার নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, সে জানেনা তার বিপক্ষ শক্তি কতই না প্রবল ! এবং তাদের (বিপক্ষের) মোকাবেলায় তার বা তার সাথীদের, এমনকি সমগ্র আরবদের, কোন তুলনাই হয় না, যতবারই সে যুদ্ধ করবে ততবারই সে পরাজিত হবে এবং পূর্বের থেকে তার

অবস্থা আরো খারাপ হবে। সেইজন্য পশ্চিমা জগতের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এক পাগল নেতার উদ্ভব হয় যে, তার ভাবোচ্ছাস ও আবেগ দ্বারা গোটা জাতির হৃদয়কে তো জয় করেছে বটে। যেহেতু সে ছিল কাণ্ড-জ্ঞানহীন, সেহেতু সে তার জাতির কাণ্ড-জ্ঞান উদয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে তার প্রতিটি পদক্ষেপ যা সে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করেছিল সেটা পরিণামে তার ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধেই গেল। যতবারই শত্রুদের সাথে তার মোকাবেলা হয় ততবারই সে তার উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয় বরং সর্বদা কিছু না কিছু তার হাত ছাড়া হয় এবং ক্রমাগত হতেই থাকে। কিছুকাল পর্যন্ত তার উত্তরসূরীরাও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে থাকল। অতএব, পশ্চিমাদের নিকট পূর্ববর্তী সময়-কালের বিশ্লেষণ ইহা ছিল যে, মুসলমান আরবদের মধ্য থেকে এক ভাবাভেগ প্রবণ উন্মাদ নেতার উদ্ভব হয়েছিল। অনুরূপ বিশ্লেষণই এখন সাদ্দাম হোসেনের ক্ষেত্রে পেশ করা হচ্ছে। পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, দেখ, আর এক উন্মাদ নেতা দণ্ডায়মান হয়েছে। এমন উন্মাদ যার ভিত্তি মূলে রয়েছে "নাসের তন্ত্র" (অর্থাৎ জেনারেল নাসেরের নীতি-দর্শন)। তার কর্মসূচী কেবল নাসেরের কার্যক্রমের উপরই স্থাপিত নয় বরং হিটলার ও হিটলার তন্ত্রের সাথে সংযুক্ত, যাকে "নাৎসী তন্ত্র"ও বলা হয়। আসল নাম তো "নাৎসীইজম"। কিন্তু তার প্রতীক হয়ে দণ্ডায়মান হয়েছিল হিটলার। সেজন্য ইহাকে হিটলার সুলভ কার্যক্রমও বলা যেতে পারে। সুতরাং আজকাল পাশ্চাত্য জগতে ফিল্ম, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে হিটলারের যুগের ছবি অত্যধিক দেখানো হচ্ছে। যুদ্ধের এরূপ ঘটনাবলী পেশ করা হচ্ছে যেন, "নাৎসীইজম" এর যুগের স্মৃতিসমূহ পশ্চিমাদের স্মৃতি পটে আবার ভেসে ওঠে। কিছু না বলে অবচীনাক্রমে তারা (পাশ্চাত্যবাসীরা) নাৎসীইজম এর যুগ ও কারণসমূহকে জেনারেল সাদ্দাম হোসেনের যুগ ও তার

কারণ সমূহের সাথে এক করে দেখতে পারে। এটা হলো পশ্চিমাদের বিশ্লেষণ। কিন্তু কোন পশ্চিমা চিন্তাবিদ বল্লেন না যে, এই উদীয়মান নেতারা যদি প্রকৃতপক্ষে রুগ্ন মস্তিষ্ক সম্পন্ন থাকত তা'হলে এই রুগ্ন মস্তিষ্কসমূহকে সৃষ্টিকারী ব্যাধিটি কি? তারা এই চিন্তা করে না যে, রুগ্ন মস্তিষ্কগুলিকে কেটে দেওয়া হলেও তো রোগ থেকেই যাবে এবং সেই রোগ অনুরূপ আরো রুগ্ন মস্তিষ্ক সৃষ্টি করতে থাকবে। কখনো এই ব্যাধি ও তার প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। এই মূল ব্যাধিটি কি? তা'হলো ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্যের ক্রমাগত ইসরাঈল প্রীতি। যখনই দুই পক্ষ অর্থাৎ ইসরাঈল অথবা মুসলমান আরবদের স্বার্থের প্রশ্ন উঠেছে বিনা ব্যতিক্রমে সর্বদা পশ্চিমা শক্তিগুলি ইসরাঈলকে প্রাধান্য দেওয়ার পথ অবলম্বন করেছে এবং মুসলমানদের স্বার্থকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং এই ব্যাধির সার কথা একজন আরব কবি তার কবিতার এক সরল পংতিতে এরূপে বর্ণনা করেছেন।

من كان يلبس كلبه شيء و يقنع لى جلدى

فالكلب خير عنده منى و خير منه عندى

অর্থাৎ --- "ঐ ব্যক্তি কুকুরকে পোষাক পরিধান করায়; কিন্তু আমার জন্য আমার চামড়াকে যথেষ্ট মনে করে। নিঃসন্দেহে তার কাছে কুকুরটি আমার চেয়ে উত্তম এবং আমার কাছে কুকুরটি তার চেয়ে উত্তম" --- বস্তুতঃ এটাই উক্ত রোগের চূড়ান্ত নির্ণয়। আরব জগতের হৃদয়ে এ বিষয়টি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে এবং তাদের এই বিশ্লেষণ বাস্তব-ভিতিক। পশ্চিমা শক্তিগুলি নিজ কুকুরদিগকে পোষাক পরিধান করাবে কিন্তু আমাদিগকে উলঙ্গ রাখবে, এই অবস্থা ইসরাঈল এবং আরবদের মধ্যে তুলনার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রযোজ্য হয়।

বর্তমান পরিস্থিতির কারণসমূহ ঃ

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে পশ্চিমা জগতের প্রতিক্রিয়া সর্বদাই এই ছিল যে, এই অজ্ঞ আরব জাহানের কবল থেকে বাঁচার এবং তাদের অনিষ্ট থেকে জগতকে বাঁচাবার একমাত্র পথ হলো আরব জাহানকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দাও, টুকরো-টুকরো করে দাও এবং আগামীতে তাদের উত্থানের সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দাও। এটা এরূপই এক বিশ্লেষণ যা ততটা ভয়াবহ এবং অপরাধজনক নয় যতটা প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরও করা হয়েছিল। উভয় অবস্থাতেই তাদের এই বিশ্লেষণ নিঃস্ফল সাব্যস্ত হলো। যে মৌলিক কারণসমূহ "নাৎসী তন্ত্রকে" জন্ম দেয় অথবা "নাসের তন্ত্রকে" অথবা "সাদ্দামতন্ত্রকে" জন্ম দেয়, ঐ কারণসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে, ঐ ব্যাধি সঠিক নির্ণয় করে উহার চিকিৎসার দিকে যতদিন পর্যন্ত মনোযোগ না দেওয়া হবে ততদিন পর্যন্ত উহা বার বার মাথা চারা দিতে থাকবে, সেই মাথা কর্তিত হতে থাকবে এবং অন্যান্য মাথাসমূহের কর্তিত হওয়ার কারণও হতে থাকবে। এই ফোঁড়া পাকতে থাকবে। শেষ অবধি এমন সময়ও আসতে পারে যখন পশ্চিমের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। সাদ্দাম হোসেনকে যে শক্তি দেওয়া হয়েছে এটাও পাশ্চাত্যের বেইনসাফী ও নীতি হীনতার প্রতিফলন। এর পূর্বে পশ্চিমারাই খোমেনীতন্ত্রের ভিত্তি রেখেছিল। ফ্রান্স সেই পশ্চিমা দেশ, যেখানে ইমাম খোমেনী সাহেব আশ্রয় নেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ ফ্রান্সের হেফাযতে থাকেন। ফ্রান্সের প্রভাব ও সহায়তার ফলে এইরূপ প্রচার অভিযান শুরু করা হয় যা শেষ পর্যন্ত ঐ বিপ্লব বয়ে নিয়ে আসে যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই সময়ে পশ্চিমাদের এই আশংকা ছিল, যদি "খোমেনী তন্ত্র" বিজয় লাভ না করে অর্থাৎ

ধর্মীয় বিপ্লব না আসে। তাহলে শাহের প্রতি দেশবাসীর ঘৃণা গভীর হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই "সমাজতান্ত্রিক" বিপ্লব সাধিত হবে। মোট কথা "খোমেনীতন্ত্র" অথবা ইরানে পরিচালিত ইসলামের ভাবধারার প্রতি (পশ্চিমাদের) ভালোবাসা ছিল না বরং এর চেয়ে বড় শত্রুর ভয় ছিল যা এদেরকে বাধ্য করেছিল যেন এরা "খোমেনীতন্ত্রকে" লালন করে। অতঃপর, যখন (খোমেনীর অনুসারীরা) শক্তি লাভ করল, যেহেতু এরা ধর্মীয় লোক ছিল এবং জানতো যে, ধর্মীয় ভাবাবেগের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় এসেছে, তাই তাদের স্বার্থের জন্য এটা অত্যাবশ্যকীয় ছিল যে, ধর্মীয় আবেগকে জিইয়ে রাখার জন্য এক "ঘৃণার" বদলে আর এক "ঘৃণার" দিকে মোড় ঘুড়িয়ে দিতে হবে। প্রথম বিপ্লব ছিল ঘৃণা-ভিত্তিক এবং সে ঘৃণা ছিল ইরানের শাহের প্রতি এবং এর পটভূমিতে শাহের শক্তিশালী মিত্র ও অভিভাবক আমেরিকার প্রতিও। সুতরাং ঘৃণাকেই তারা ধর্মীয় সুবিধা লাভ করার জন্য ব্যবহার করল এবং আমেরিকাকে "বড় শয়তান" রূপে তুলে ধরা হলো। জাতির ঐ ধর্মীয় আবেগগুলিকে সজীব রাখা হল যা ঘৃণার সাথে সম্পর্কিত ছিল। এই কারণে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ 'খোমেনীতন্ত্র' শক্তি লাভ করতে লাগলো। সুতরাং এর পূর্বে এই এলাকাতে যে অশান্তি হয়েছে, যে সকল ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছে অথবা যে দাঙ্গা ও হত্যা কাণ্ড ও লুটতরাজ হয়েছে কিংবা বেইনসাফী হয়েছে সেগুলিরও মূল দায়-দায়িত্ব পশ্চিমাদের ওপর বর্তায়। মূল দায়িত্ব এই জন্য যে, শাহের যুলুম-অত্যাচারের ক্ষেত্রেও পশ্চিমাদের অভিভাবকত্বই দায়ী ছিল। এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমেরিকা আজ পৃথিবীতে গুপ্তচর বৃত্তিতে এতই পারদর্শী যে, দূর দূরান্তের এমন সব ঘটনা যার সম্বন্ধে সেই দেশের অধিবাসী-গণও ঠাহর করে উঠতে পারে না। যার সম্বন্ধে সে দেশবাসীর চেতনাবোধও জাগ্রত হয়ে উঠে না, কিন্তু তাদের ইন্টেলিজেন্ট-

(চরদের) রিপোর্ট তাদেরকে অবহিত করে দেয়। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আমাদের দেশে যে কয়টি বিপ্লব এসেছে এগুলির সম্বন্ধে আমেরিকার কাছে অভিযোগ করা হয়েছে যে, আমাদেরকে আগে-ভাগে খবর দাও নাই কেন? অর্থাৎ এক নেতার (সরকারের) পতন হয়েছে, একদলকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হয়েছে এবং তারা আমেরিকার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তোমরা আশ্চর্য ধরণের লোক। আমাদেরকে পূর্বাহ্ন খবরই দিলে না? আফসোস! তোমাদের নিজেদের দেশের খবর নিজেরাই রাখ না আর সেজন্য নালিশ করছ, "আমাদের খবরই দাও নাই।" অতএব, চেতনার অভাব প্রাচ্যে যত স্পষ্টতর হতে যাচ্ছে এবং নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে মত অনুভূতিহীনতা বাড়ছে, ততই এই জাতিগুলির মধ্যে অন্যদের ব্যাপারে সংবেদনশীলতা জাগ্রত হচ্ছে এবং অনুভূতি প্রখর হয়ে চলেছে।

আমেরিকার রীতি-নীতি:

অতএব, ইহা কি ভাবে সম্ভব যে, ইরানের শাহ্ কিরূপ অত্যাচার সেখানে করেছে এবং কি ধরণের ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সেই দেশে সৃষ্টি হয়েছিল আমেরিকা তা অবগত ছিল না? এই সকল অত্যাচারের সময় ইরানের শাহের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রথমেই দায়ী আমেরিকা। দুনিয়ার বিবেকবান ব্যক্তি আমেরিকাকে এই দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। এখানে কোন শত্রুতা বা আবেগের কথা নয়, এটা এরূপ বাস্তবতা যে, অল্প বুদ্ধিমান সুধীজনও আজ এটা মেনে নিতে বাধ্য যে, ইরানের "রাজতন্ত্র" আমেরিকারই প্রতিপালিত ছিল, এর ফল-শ্রুতিতে সৃষ্ট সকল প্রতিক্রিয়ার দায়িত্ব আসলে আমেরিকার উপরই পড়ে। এই সকল প্রতিক্রিয়াকে শামাল দেওয়ার জন্য

আমেরিকা যে ধরণের কার্যক্রম অবলম্বন করেছে, তা তাদের স্বার্থে ও তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, দুনিয়ার স্বার্থের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল। তারা মনে করেছিল এই প্রতিক্রিয়া দ্বারা এমতাবস্থায় দু'টি শক্তিই লাভবান হতে পারে। "খোমেনী তন্ত্র" অর্থাৎ ধর্মীয় শক্তি অথবা "সমাজতন্ত্র"। যেহেতু "সমাজতন্ত্র" তার চরম শত্রু ছিল এবং সেই সময় "সমাজতন্ত্র" এই এলাকায় প্রাধান্য লাভ করলে, সেই সন্ধি, যা আজ আমেরিকা ও রাশিয়ার মাঝে হয়েছে, তা কখনোই হতে পারতো না। আর 'সাদ্দামতন্ত্র'ও সৃষ্টি হতো না। তা'ছাড়া রাশিয়া এবং রুশপন্থী ইরানীদের তরফ থেকে মধ্য-প্রাচ্যের শান্তি সংকটের সম্মুখীন হতো এবং এমন সংকটের সৃষ্টি হতো যার কোন বিকল্প ব্যাবস্থাও মোকাবেলা করবার মত কোন শক্তি তাদের কাছে থাকত না। অতএব, নিজ স্বার্থে এবং এবং যেমন কিনা তারা পেশ করে থাকে যে, সমগ্র পৃথিবীর শান্তির স্বার্থে, তারা খোমেনীতন্ত্রকে সৃষ্টি করেছে এবং একে লালন করেছে। যখন ইহা (খোমেনীতন্ত্র) শক্তি লাভ করল, তখন ইরান নিজের বুদ্ধি খাঁটিয়ে নিজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং আমেরিকার মন্দ প্রভাব থেকে ইহাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটা মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করলে, মাঝামাঝি পথ এই অর্থে ছিল যে, রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করা। কিন্তু ইসলামী ন্যায়-নীতির দিক থেকে ইহা মধ্যম পথ ছিল না। কেননা, এরা নিজেদের ডান দিকে চরম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এবং নিজেদের বাম দিকেও চরম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে এবং তা করেছে ইসলামের নাম নিয়ে। সুতরাং মুসলিম বিশ্ব এতে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরপর ইরানের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য "সাদ্দাম তন্ত্রকে" সৃষ্টি করা হলো। ইরাককে সকল দিক থেকে উৎসাহ দেওয়া হলো। সকল আরব শক্তি যারা তাদের (আমেরিকার) প্রভাবাধীন ছিল, তাদের মাধ্যমেও সাহায্য দেওয়া

হলো এবং সরাসরি ভাবেও। এমন কি (ইরান-ইরাক যুদ্ধের) এক পর্যায়ে যখন ইরাক ভীষণ সংকটের সম্মুখীন হলো এবং পরিস্কারভাবে দেখা যেতে লাগলো যে, ইরান বাগদাদ দখল করে নিবে। তখন আমেরিকা স্পষ্টভাবে এই ঘোষণা দিল যে, এটা হবে না। সুতরাং তড়িৎ গতিতে ইরাকের প্রতিরোধ শক্তিকে বাড়িয়ে, আক্রমণাত্মক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হলো। পৃথিবীতে আজ প্রোপাগাণ্ডা করা হচ্ছে যে, সাদ্দাম হোসেন এমনই অত্যাচারী ও নির্দয় ব্যক্তি যে, বিষাক্ত গ্যাস, যা স্নায়ু ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়, অথবা শরীরে ফোস্কা সৃষ্টি করে অথবা শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে, সে তা মানব জাতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে কুন্ঠাবোধ করে না। সেই জন্য এই অত্যাচারী ব্যক্তি থেকে পৃথিবীকে বাঁচানো অত্যাবশ্যকীয়। এই প্রচারকারী তো অতীতে সেই জাতিই ছিল যারা এই বিষাক্ত গ্যাসসমূহ বানানোর পদ্ধতি ও জ্ঞান ইরাককে শিক্ষা দিয়েছিলো এবং এ সম্পর্কে তারা অবগত ছিল। তাদের চোখের সামনেই ক্রমাগত সেই সকল গ্যাস কারখানা বানানো হলো এবং তাদেরকে এই সম্বন্ধে সকল ধরণের প্রযুক্তি দান করা হলো, কেননা, সেই সময় বিপক্ষীয় বড় শত্রু ছিল ইরান। পশ্চিমা জাতিগুলি যদি আজ এই কথা বলে, আমরা জানতাম না যে, এ কাজ তো ইরাক গোপনে নিজে নিজেই করে নিয়েছে, তা হবে সম্পূর্ণ মিথ্যা

লিবিয়াতে যখন গ্যাস কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হয়, তখন তারা সেখানে বোমা বর্ষণ করে এবং দুনিয়াতে ঘোষণা দেয় যে, আমরা কিছুতেই এ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে দেব না। কেননা, এটা দুনিয়ার শান্তির জন্য বড় হুমকির কারণ হবে। অতঃপর, তারা বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করে, যা আশ্চর্যজনকভাবে সঠিক ছিল। তারাই জানালো যে, লিবিয়া বলছে, তারা গ্যাস তৈরী করছে না, বরং অন্যান্য ধরণের কৃত্রিম সার ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করছে। আমরা এর ভেতরকার ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি।

এটা ঐ কারখানা যেখানে অমুক অমুক জিনিস তৈরী বা প্রস্তুত হচ্ছে এবং এতটুকু তৈরী হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে তারা পুংখানুপুংখ ভাবে অবগত ছিল এবং তা তারা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরলো। অতএব, ইরাকের ব্যাপারে তাদের চোখ কিরূপে বন্ধ ছিল। বস্তুতঃ তখন তারা এর (ইরাকের) পিছনে দণ্ডায়মান ছিল এবং চাচ্ছিল যে, কিছুতেই ইরাক বা আরব বিশ্বের উপর যেন ইরানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হয়। অন্যথায়, তাদের আশংকা ছিল, গোটা ব্যাপারটাই তাদের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। আর সেই সময় ইরান চিৎকার করছিল, চরম যুলুম হয়ে গেল! কি নৈরাজ্যই না চলেছে! কি ভীষণ নৃসংশতা! তারা (ইরান) তাদের অসুস্থ ব্যক্তিদের ছবি দেখাচ্ছিল এবং (অত্যাচারের) যৎসামান্য ঝলক দেখানোর পর তারা সকল দৃশ্য দুনিয়াতেদেখানো বন্ধ করে দিল। এখন যেভাবে তারা সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষেপা এবং বিকৃত মস্তিষ্ক বলে, এই বিকৃত মস্তিষ্ককে তো তারা নিজেরাই জন্ম দিয়েছে। এখন যেহেতু তাদের এই বিকৃত মস্তিষ্ককে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার ইচ্ছা হয়েছে, সুতরাং ঐ সকল দৃশ্য যা ইরানের প্রতি নৃসংশতা ঘটার বেলায় পূর্বে ইরান দেখিয়েছিল, সেগুলিকে এখন দুনিয়ার সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। আর বলা হচ্ছে যে, সাদ্দাম এমন অত্যাচারী ব্যক্তি যে, নিজ ভাই ইরানী মুসলমানদের উপর এমনিতরো নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছিল। এই অত্যাচার থেকে পৃথিবী কিভাবে বাঁচবে? কিরূপেই সে অন্যদের প্রতি দয়া করতে পারে? অথবা অন্যের সাথে মনুষ্যত্বের ব্যবহার করতে পারে? এই প্রতিক্রিয়াটি হল সেই পুরানো পদ্ধতির প্রতিক্রিয়াই। সেই পুরানো পদ্ধতিই অর্থাৎ ব্যাধিকে দেখা হয় না যা বিকৃত মস্তিষ্কের জন্ম দেয়। এই পরাশক্তিগুলি, যারা নিজের সর্বদা রোগ সৃষ্টি করতে সাহায্যকারী হয়ে থাকে, তারা রোগকে উপেক্ষা করে; রুগ্ন শক্তিগুলিকেও প্রথমে হেলা করে এবং ব্যাধির শুরু থেকে আগলিয়ে

নিয়ে চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছিয়ে দেয়। পরিশেষে জগতের দৃষ্টি কেবল রুগ্ন, বিকৃত মস্তিষ্কের দিকে আকৃষ্ট করিয়ে দেয়। কেননা, সেই মস্তিষ্কগুলিকে তারা দেহ থেকে পৃথক করতে চায়, আর দুনিয়াকে দেখাতে চায়, এটা করা ছাড়া আমাদের জন্য আর উপায় নেই। আমরা অপারগ, একটি উন্মাদ মস্তিষ্কের আবির্ভাব ঘটেছে, যার জন্যে ইহা অবধারিত যেন উহাকে দেহ থেকে আলাদা করা হয়, নচেৎ ইহা অবশিষ্ট দুনিয়ার মস্তকসমূহের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ইসলামের জন্য ক্ষতির কারণ

শেষকথা এই যে, রুগ্ন মস্তিষ্ক কেন সৃষ্টি হচ্ছে? পাশ্চাত্যের আচার-আচরণই এর জন্য দায়ী। আরবীয় মুসলমান এবং ইরানের মুসলমানদের সাথে, এদের আচার-আচরণ অত্যাচারমূলক ছিল, নৃশংসতামূলক ছিল, আক্রমণাত্মক ছিল। এতদ্‌সত্বেও যে এরা তাদের মধ্যকার বহু রাষ্ট্রের বন্ধুত্বের হাত জয় করে নেয়; তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে এবং বাহ্যতঃ তাদের সাহায্যকারী সাজে। কিন্তু কার্যতঃ এই বন্ধুত্বের স্পষ্ট কারণ ছিল এই যে, এদের থেকে (আরবদের কাছ থেকে) লাভবান হতে হলে তাদের সাথে বন্ধুত্বই উত্তম উপায়। এদের তেলের সম্পদ ও অর্থ সাবিকভাবে তারা নিজেদের ব্যাংকে রাখলো এবং তাথেকে দু'ধরণের ফায়দা লাভ করল। একেতো খুব মোটা ধরণের পুঁজির ভাণ্ডার জমা হয়ে গেল, যদ্দরুন তাদের পুঁজি বিনিয়োগে অসাধারণ শক্তির সঞ্চার ঘটলো। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক বিপদের সময়ে ঐ অর্থ ও ধনের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার তাদের হাতে এসে গেল। যখন বলা হয় (ঐ অর্থ ও ধন-সম্পদ তো তোমাদের হাতে) অন্যের আমানত, তখন তাদের আমানতের ধ্যান-ধারণা বদলে যায়। একজন

নাগরিক যখন অন্য দেশে যায় তখন সে সেই দেশের আমানত স্বরূপ হয়ে থাকে। এ আমানতের খেয়ানত করা কিছুতেই উচিত নয়। কিন্তু শান্তি এবং বন্ধুত্বের সময়, বিশ্বাসের ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থালব্ধ নিরাপত্তসমূহের সাহায্য গ্রহণ পূর্বক অথবা ভুল বশতঃ তাদের উপর বিশ্বাস করে যখন তাদের ব্যাংকে অর্থ সম্পদ জমা করানো হয়, শত্রুতার সময় তাদের সম্পদের উপর হাত রেখে তখন ইহা বলার তাদের কি অধিকার থাকে যে, এই সম্পদকে আমরা মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে আটক করলাম। এইরূপে প্রাচ্যের দেশগুলোর কতইনা সম্পদ প্রত্যেক যুদ্ধ ও হুমকির সময়ে আটক করা হয়েছে! এখনও কুয়েতের সম্পদ আটক করা হয়েছে। কিন্তু এই নিয়্যতের সাথে করা হয়েছে যে, তাদের বন্ধুত্বের কারণে পরে তা ছেড়ে দেয়া হবে। তাছাড়া ইরাকের সকল ধন-সম্পদ যা বিদেশে ছিল, তা সবই আটক করা হয়েছে। এইগুলি হচ্ছে ধোকাবাজির সূক্ষ্ম পথ।

কিন্তু এই যাবতীয় চাতুর্য এবং অত্যাচারমূলক কার্যক্রমকে তারা অত্যন্ত মার্জিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরতে ওস্তাদ। এ ব্যাপারে এরা পারদর্শিতার চূড়ান্ত মার্গে উপনীত। এদের চানক্যনীতির মোকাবেলায়, প্রত্যেকবার অভাগা মুসলিম আরব বিশ্ব বুদ্ধি-বিবেচনা ও বাস্তবতার বদলে আবেগ ও ভাব-প্রবণতা দ্বারা নিজেদেরকে পরিচালিত করেছে। বার বারই ভাব-প্রবণতা ও বুদ্ধির সংঘর্ষ ঘটিয়ে নিজেদের উদ্যমকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এতে করে তারা মুসলিম বিশ্বকে আরও লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে। সবচেয়ে বড় ভুল আরব বিশ্ব এই করেছে এবং সর্বদাই করে চলেছে যে, রাজনৈতিক উস্কানী ও পার্থিব বিষয়াদির ক্ষেত্রে স্বার্থপর জাতিগুলির প্রতিক্রিয়া ধর্ম-ভিত্তিক না হয়ে সর্বদা এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত কারণগুলিকে (আরবরা) উহাদের যথাযথ স্থানে রাখার পরিবর্তে, সেগুলিকে ধর্মীয় রূপ দিয়ে দেয়।

এর ফলে যেখানে যে কারণেই কোন শত্রুতা বা ঘৃণার সৃষ্টি হোক না কেন, তা ইসলামের নামে আরোপিত হয়ে থাকে। ঐ জাতিগুলি, যারা আপনাদের স্বার্থের উপর হামলা করেছে, মানবতা আপনাদিগকে তার মোকাবেলা করার অধিকার দিয়েছে। এই মোকাবিলাকে অকারণে ইসলামী জেহাদের নাম দিয়ে তাদেরকে এখন এ সুযোগও দেওয়া হয়েছে যে, প্রথমে তো এরা শুধু মুসলিম বিশ্বের উপর হামলা করতো। এখন যেন তারা ইসলামের উপরও হামলা করতে পারে। আর মানবজাতিকে এই কথা বলতে পারে "দেখ, আসল ব্যাধি তো ইসলাম, ইসরাঈলতন্ত্র নয়। আমাদের অবিচার এর জন্য দায়ী নয় বরং ইসলামই একটি বক্র ধর্ম, যা বক্রতাকে জন্ম দেয়। ইহা একটি অবিচারমূলক ধর্ম যা অবিচারমূলক ধ্যান-ধারণাকে প্রসারতা দেয়। আসলে সকল ব্যাধি ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যেই নিহিত।" সুতরাং ইরানের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও অনৈসলামিক প্রতিক্রিয়া ছিল, যার সাথে ইসলামের দূরবর্তী সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারটিকে যদি জাগতিক নিয়ম নীতি অনুযায়ী তুলে ধরা হতো তাহলে পৃথিবীকে অনেক খানি নিশ্চিন্ত করা যেত যে, আমরা নির্যাতিত, এখন আমাদের বদলা নেওয়ার সময়, কেননা আমরা নিরুপায়। বিষয়টাকে এভাবে বল্লে দুনিয়া স্বল্প পরিমাণে হলেও বুঝতে পারতো। ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্বের অজ্ঞতার একশেষ যে, সোজা সরল কথার বদলে, দুনিয়াকে স্পষ্ট ভাষায় বলার পরিবর্তে যে, আমরা নিরুপায়, আমরা অসহায়, যখনই আমরা সুযোগ পাব তারা আমাদের মধ্যে যে ঘৃণার সৃষ্টি করেছে এবং অবিচার ও অন্যায়ের বহু শতাব্দী পার করেছে, আমাদের বর্তমান প্রতিক্রিয়ার পিছনে দণ্ডায়মান রয়েছে ; তাই আমরা বাধ্য হয়ে দুর্বল ব্যক্তির মত প্রতিক্রিয়া দেখাব, যার হাতে কোন ইট আসা মাত্রই সে সেটাই তুলে মারে। সে চিন্তা করে না যে, এর ফলে তাকে কি

শাস্তি দেওয়া হবে। অথবা ভাবেও না যে, ক্ষমতাশীল ব্যক্তি তার সাথে কি ব্যবহার করবে? সে সব কিছু না ভেবেই ইট মেরে দেয়। এই অবস্থাকে তাক্ওয়া ও ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী সরল-সোজা প্রতিশ্রুত ভাষায় স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরা উচিত ছিল। আর এরূপ করার মধ্যেই অসাধারণ কল্যাণ নিহিত ছিল। কিন্তু তা না করে, তারা সুযোগ-সন্ধানীদেরকে ইসলামের উপর হামলা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। প্রথমতঃ বলেছে, 'আমাদের দেহের উপর আক্রমণ কর।' অতঃপর এই বলে আমন্ত্রণ—জানিয়েছে, 'এখন আমাদের আত্মার উপরও হামলা কর।' এই ভাবে অন্যায় ও অত্যাচারমূলক ভাবে ইসলামী শিক্ষাকে তারা নিজেরাই দুমরিয়ে মুচড়িয়ে বিকৃত-রূপে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছে। এর ফলশ্রুতিতে, দুনিয়ার সকল চিন্তাশীল লোক যদিও জানতো যে, আসলে এটা ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া নয়, তবুও যদি এরা নিজেরাই (মুসলমানেরাই) একে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া বলে আখ্যা দেয় তাহলে তাই ভাল। চল, আমরা এদের ধর্মের উপরই আক্রমণ করি এবং পৃথিবীকে বলি, এদের মস্তিষ্ক বক্র নয় বরং এদের ধর্মই বক্র। সুতরাং মস্তিষ্ক, যাকে এরা দুনিয়ার সামনে রুগ্ন বলে তুলে ধরেছিল. যে মস্তিষ্ক তাদেরই সৃষ্টি করা ব্যাধির দরুন রুগ্ন হয়েছিল। মুসলিম জগতই প্রকারান্তরে তাদেরকে এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিল যে, তাদের ব্যাধির মূল কারণ যেন ইসলামকে সাব্যস্ত করা হয়। অতঃপর, আরো সুযোগ দিল যেন তাদের ভ্রান্ত রোগ নির্ণয় প্রতিক্রিয়াকে পুনরায় দুনিয়ার সামনে পেশ করা যায় এবং দুনিয়া যেন সেটাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কেননা রোগ নির্ণয়ে, অসুস্থ ব্যক্তির কথাই বেশী গ্রহণযোগ্য। অসুস্থ ব্যক্তি বলে যে তার মাথায় ব্যথা এবং সাথে এও বলে যে, সে অমুক বস্তু খেয়েছিল এবং এই কাজ করেছিল যার ফলে তার মাথায় ব্যাথা হয়েছে। ডাক্তার যদি

অন্য কোন কারণ দেখায়, তবুও তাতে কেউ সন্তুষ্ট হবে না। সুতরাং যখন এই রুগ্ন মস্তক দুনিয়াকে দেখানো হয়, তখন সেই সংগে এও বলা হয় যে, এই রোগী তার রোগের উত্তম নির্ণয় নিজেই করে দিয়েছে। এই রোগী বলে যে, আমার ধর্ম উন্মাদ আমার ধর্ম আমাকে অন্যায়-অবিচারে বাধ্য করে ; আমার ধর্ম বলে, যে স্ত্রীলোক ও শিশুদের ওপর যুলুম কর এবং এভাবে প্রতিশোধ নাও। এই পদ্ধতিতে প্রতিশোধ নেবার কার্যকলাপের হক্ দিয়েছে, বোমাবাজি করে শহরের শান্তি বিনষ্ট করার হক্ দিয়েছে। তাই যে ভাবেই পার নিজেদের দুঃখের প্রতিশোধ লও। কেননা, তোমাদের পিছনে খোদা দণ্ডায়মান, ইসলাম দণ্ডায়মান। তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের নামে এইরূপ কর। বস্তুতঃ এসব কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও সম্পূর্ণ ভুল। এর মধ্যে বৈধতার লেশ মাত্রও ছিল না ও নাই। যে সব বিষয়ে আমি বর্ণনা করলাম এইগুলি এরূপ তথ্য যে, দুনিয়ার সামনে যেখানেই ইহা তুলে ধরুন না কেন, দুনিয়া মেনে নিতে বাধ্য হবে যে, "রুগ্ন মস্তিষ্ক" কেন? এবং "রোগের" কারণ কি? প্রকৃতপক্ষে এই নির্বোধ যালেমেরা শুধু নিজের উপরই হামলা করতে দেয় নাই বরং স্বীয় ধর্মকেও আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানাবার জন্য সামনে তুলে ধরেছে। এটা হলো সকল অত্যাচারের সারমর্ম, যা বর্তমানে দিব্যি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, এই মুসলিম নেতৃবর্গ যেন এইগুলির পিছনে সক্রিয় কারণসমূহকে অনুধাবন করেন। তাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি যেন ব্যাধির মূলের দিকে নিবদ্ধ করেন এবং অন্যের দৃষ্টিও যেন সেদিকে আকৃষ্ট করেন, তারা যেন দুনিয়ার সামনে এই বিশ্লেষণ বিষদভাবে তুলে ধরেন যে, আজ আমরা বাধ্য হয়ে সাদ্দামের বিরুদ্ধে তোমাদের সাথে মিলিত হয়েছি। কিন্তু এর অর্থ কখনও ইহা নয় যে, তোমরা বর্তমান অবস্থা সৃষ্টির দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং এর অর্থ কখনও ইহা

হতে পারে না যে, সাদ্দামকে সরানো অথবা ইরাকের ধ্বংস মুসলিম বিশ্বের সমস্যার সমাধান। এটা বরং মুসলিম বিশ্বের জন্য আরও বেশী ধ্বংসের কারণ হবে। কেননা ঐ সকল কারণ ও ব্যাধি সমূহ তো থেকে যাবে, যার দরুন বার বার মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে এবং যে কারণে বার বার বিশ্ব তদ্দরুন সংকিত হয়েছে।

ইসরাঈলের পৃষ্ঠপোষকতা ঃ

সুতরাং যতটুকুন ন্যায় বিচারের প্রশ্ন সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, ইসরাঈল প্রত্যেক যুদ্ধের পর মুসলমানদের কিছু না কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছে। দখলকে বজায় রাখার জন্য পশ্চিমা শক্তিগুলি সর্বদা ইসরাঈলের সঙ্গ দিয়েছে। মিশরের কিছু অংশ খালি করানো ব্যতিরেকে অন্য কোথাও এক ইঞ্চি জমিও খালি করানো হয় নি। মিশরের সিনাই মরুভূমি থেকে ইহুদী দখলদারী শেষ করানোর পূর্বে, মিশরকে নতজানু হতে বাধ্য করা হয়েছে। ইসরাঈলের সাথে এমন এক সন্ধি করতে বাধ্য করা হয়েছে যে, যার ফলে পাশ্চাত্যের ধারণা ছিল, মিশর চিরদিনের জন্য মুসলিম বিশ্ব থেকে ছিন্ন হয়ে যাবে এবং মুসলিম বিশ্বের শত্রুতার লক্ষ্যস্থল হয়ে যাবে। এইরূপ অবস্থায় এর (মিশরের) টিকে থাকা পাশ্চাত্যের উপর নির্ভর করবে। যতদিন পাশ্চাত্য এর সাহায্যকারী হয়ে থাকবে, ততদিন মিশর জীবিত থাকবে নতুবা খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া হবে। এটা তাদের সেই ধারণা ছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমারা মরুভূমির ঐ এলাকা মিশরকে ফেরৎ দেওয়ায়, যেটা ইহুদীদের দখলে ছিল। এছাড়া অন্য কোথাও এক ইঞ্চি জমি খালি করানো হয়নি। অর্থাৎ ইসরাঈলের কাছ থেকে ঐ সকল দেশের এলাকাগুলির এক ইঞ্চিও ফেরৎ করান হয় নি। যারা নত হয়ে লাঞ্ছনাজনক সন্ধি করতে

রাজী হয়নি। জর্দান তাদের (পশ্চিমাদের) দীর্ঘ দিনের বন্ধু। এখনও (পাশ্চাত্যের সংবাদে যখন জর্দানের কথা বলা হয়, তখন উল্লেখ করা হয়, "আমাদের বন্ধু"। আমরা এর (বন্ধুত্বের) উপর সবচেয়ে বেশী আস্থা রেখেছিলাম। আরো বলে, আমরা কতই না পাগল ছিলাম! এরা কতই না বিশ্বাস ঘাতক বন্ধু সাব্যস্ত হলো! এবং এরা দেখল না, (জর্দানের) বন্ধুত্বের বদলে, তারা দিয়েছে কি? দীর্ঘ যুগ ধরে এই বন্ধুর মাতৃভূমির একটি অত্যন্ত মূল্যবান অঞ্চল তার শত্রুর দখলে রয়েছে। তারা সর্বদা জর্দানের শত্রুকে শক্তিশালী করেছে। শত্রুর অবৈধ দখলকে বজায় রাখার জন্য সাহায্য করেছে। ইহা সত্বেও জর্দান তাদের বন্ধুই থাকে। কুরআন মজীদ যেখানে বলেছে, "বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব করিও না।" এর কারণেও ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে। যার কারণে মধ্য যুগে কোন কোন মুসলমান উলামা ইসলামের আরো বদনাম করেছেন। প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত অবস্থা ও পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ইসলাম বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে বারণ করেছে। উপদেশটি হচ্ছে, ইসলাম এবং নায় বিচারকে বিসর্জন দিয়ে কোন রূপ বন্ধুত্ব কর না। এই সেই পটভূমি, যার সম্বন্ধে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে ইহাও উল্লেখ করা হয়েছে, "ঐ সকল লোক যারা তোমাদের প্রতি শত্রুতা করে না, এবং অন্যায়, অবিচারমূলক ব্যবহার করে না, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে খোদা তোমাদিগকে নিষেধ করেন না, বরং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের শিক্ষা দেন।" এটাই হলো ইসলাম। ইসলামের ঐ শিক্ষা বিবেক বুদ্ধি সম্মত। সেটাকে এরা (মুসলমানেরা) সর্বদা উপেক্ষা করেছে। আসল শিক্ষার স্থলে তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ অর্থ বের করেছে এবং তাই কার্যতঃ অনুশীলন করেছে।

সুতরাং যেখানে বন্ধুত্ব করা নিষেধ করা হয়েছে, ওখানে বন্ধুত্ব করা হয়েছে। আর যেখানে বন্ধুত্ব করার তাগিদ দিয়ে পথ

দেখানো হয়েছে, সেখানে বন্ধুত্ব করা থেকে দূরে রয়েছে। অতএব, এদের ব্যাধির আসল কারণ ইহাই দাঁড়ায় যে, এরা তাক্ওয়া থেকে দূরে সরে গিয়েছে, কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে চলে গিয়েছে। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "মোমেন একই গর্ত হতে দু' বার দংশিত হয় না", কিন্তু তারা বহু বার দংশিত হয়েছে, তারা সেই গর্তেই আবার আঙ্গুল প্রবেশ করায় এবং একই গর্ত হতে বার বার দংশিত হতে থাকে। তবু আজও তাদের হুশ হলো না। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি পশ্চিমাদের অবস্থা বার বার বিশ্লেষণ করে তাহলে সে অজ্ঞ ও মূর্খ, বার বার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সত্বেও তারা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারল না যে, আসল ব্যাধি কি? যতক্ষণ এই ব্যাধি থাকবে বিশ্বের জন্য সর্বদা আতঙ্কের কারণ হয়ে তাদের মাথার উপর ঘুরতে থাকবে। অপরদিকে মুসলমান দেশসমূহ বার বার দুর্দশাগ্রস্থ হওয়া সত্বেও শিক্ষা গ্রহণ করেনি। বরং বার বার সেই একই ভুল করে যাচ্ছে। এর চিকিৎসা কি? এর শুধু একই চিকিৎসা আছে যা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদিগকে শিখিয়েছেন। সে দিকে আমি এর পূর্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং আবার সেই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর কতিপয় দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য থেকে এক অংশ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ঃ

শেষ যুগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (সাঃ) বলেন, "ইয়া'জুজ ও মা'জুজ দুনিয়াকে দখল করে নেবে। উত্তাল তরঙ্গের বেগে তারা উত্থিত হবে। তাদের শক্তির তরঙ্গ সমগ্র দুনিয়াকে অধীন করে নেবে, সেই সময় দুনিয়াতে মসীহ (আঃ) নাযিল হবেন

এবং মসীহ (আঃ) নিজ জামাতকে সাথে নিয়ে তার মোকাবেলার উদ্যোগী হবেন। তিনি তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করবেন তখন আল্লাহ্‌তা'লা মসীহ্ (আঃ)-কে বলবেন,

لا يدان لاحد لقتالهم

অর্থাৎ —আমরা যে এই দু'টি জাতি সৃষ্টি করেছি, দুনিয়ার কোন ব্যক্তিকে এই জাতির মোকাবেলা করার শক্তি দেই নি। একই উপায়, তুমি পাহাড়ের আশ্রয়ে চলে যাও এবং দোয়া কর। দোয়াই সেই শক্তি যা এই জাতিগুলির উপর বিজয় লাভ করবে।

এখানে পাহাড় দ্বারা কি বুঝাচ্ছে? আমি মনে করি কুরআন মজীদই সেই পাহাড় যার উল্লেখ এখানে করা হয়েছে। কেননা কুরআন করীম সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন ঃ

لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله ط وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ٥ (سورة الحشر آيت نمبر ٢٢)

অর্থাৎ — যদি আমরা এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের ওপর নাযেল করতাম, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পারতে যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে ঐ পাহাড় বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, এই সকল উপমা আমরা মানবজাতির জন্য ব্যবহার করছি যাতে তারা চিন্তা করে।

(সূরা হাশর ঃ ২২ আয়াত)

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে পাহাড় থেকে অধিক শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) পাহাড়গুলির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ পাহাড় ছিলেন। দুনিয়ার পাহাড়-গুলির মধ্যে এই শক্তি ছিল না যে, এই কালামের মর্যাদা ও মহিমাকে ধারণ ও বহন করতে পারে। কিন্তু একমাত্র হযরত

মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন যিনি সবচেয়ে উচ্চতর এবং সবচেয়ে শক্তি-শালী পাহাড় (যিনি কুরআনের শিক্ষাকে বহন করার শক্তি রাখেন)। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ এই যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর গৌরব ও মর্যাদার দিকে ফিরে এস, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর শিক্ষার আশ্রয় লাভ কর, তাঁর কাছ থেকে শক্তি আহরণ কর যদি তোমরা রসূল করীম (সাঃ)-এর মহিমার দিকে ফিরে আস এবং তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে দোয়া কর তাহলে মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর ছায়াতে লালিত দোয়াসমূহ কখনো বৃথা যেতে পারে না। সেই মহিমা হতে তোমরাও অংশ পাবে, তোমাদের দোয়াও এই মহিমার অংশ পাবে। দ্বিতীয়তঃ, এতে এই শিক্ষা রয়েছে যে, সেই সময়ের মুসলমানদিগের মধ্যে কারো সম্বন্ধে এ কথা বলা হয়নি যে, খোদা তাদেরকে বলবেন যে, তোমরা দোয়া কর। শুধু মসীহ (আঃ) এবং তাঁর জামাত সম্বন্ধেই এই কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সেই সময়ে এই লোকগুলির (মুসলমানদের) সত্য সত্যই দোয়ার প্রতি তেমন সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকবে না। তারা দোয়ার প্রতি গুরুত্বই দেবে না। এই জন্য, যাদের নিকট দোয়ার গুরুত্ব নাই তাদিগকে দোয়া করার কথা বলা সর্বৈব মূল্যহীন। সুতরাং এখন আপনারা দেখে নিন, অনেক মুসলমান নেতাদের বড় বড় বিবৃতি আসছে। কেউ বলে আমেরিকার দিকে দৌড়াও, তার আশ্রয় এবং সাহায্য গ্রহণ কর। আবার কেউ ইরানের সাথে সন্ধি করেছে অথবা নিজ শক্তি সম্বন্ধে অন্য কিছু বিবরণ দিচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে যেতে অথবা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর আশ্রয়ে যাবার কোন কথাই বলেনি। কেউই এ নসীহত করেনি, "হে মুসলমানগণ! এখন দোয়ার সময়। দোয়া কর, কেননা দোয়া দ্বারাই তোমরা শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে।"

শুধু এক জামা'তের কাছে সমাধান আছে ঃ

অতএব, একটি জামা'ত, হ্যাঁ একটি জামা'ত আছে তা হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর মসীহ্-এর জামা'ত। এই জামা'ত সম্বন্ধে খোদাতা'লা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, যদি ইসলামী বিশ্বকে বাঁচানো হয়, তাহলে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এর জামা'তের দোয়ার বরকতেই বাঁচানো হবে। কিন্তু এর জন্য শর্ত এই যে, তারা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর মহিমার আশ্রয় নিবে — তাঁর শিক্ষার আশ্রয় নিবে — তাঁর চারিত্রিক গুণের আশ্রয় নিবে — তাঁর সুন্নতের আশ্রয় নিবে। তারপর দোয়া করতে হবে। সুতরাং এই সকল সমস্যার যদি কোন অস্থায়ী সমাধান নির্ণয় করা হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে, এই সমাধান মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসী ও বিশ্ববাসীকে পূর্বের থেকে আরও বেশী খারাপ অবস্থার দিকে ঠেলে দিবে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, এবং ব্যাধি ও দুঃখ-কষ্টের সাথে যতটুকু সম্পর্ক তার কোন সমাধান হবে না। এর সমাধান যদি থেকে থাকে, তাহলে তা আপনাদের নিকটেই আছে। অর্থাৎ মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ)-এর জামা'তের কাছেই আছে। আপনারা দোয়া করুন এবং বিগলিত চিত্তে দোয়া করতে থাকুন। কেননা দুঃখ কষ্টের এই সময় আরো দীর্ঘস্থায়ী হবে। অবস্থার আরো অনেক আবর্তন বিবর্তন ঘটবে। আরো অনেক অধ্যায় পাড়ি দিতে হবে। এই জন্য দোয়া শুরু করতে আর দেরী করা উচিৎ নয়। আমরা সর্বদাই দোয়া করে থাকি। কিন্তু আজকের দুনিয়ার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, যা আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আজ দোয়া ব্যাতিরেকে দুনিয়ার ব্যাধিগুলির ও উম্মতে মুসলেমার ব্যাধিগুলির নিরাময়ের আর অন্য কোন উপায় নেই। পশ্চিমাদের জন্যও দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্-তা'লা তাদের সুবুদ্ধি দান করেন। তারা বার বার নিজেদের

চালবাজী এবং উচ্চাঙ্গের রাজনীতি দ্বারা দুনিয়ার সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিবারই বিফল হয়েছে। এক-বারও তাদের চাতুরতা দুনিয়ার কাজে আসেনি। কেননা তাদের চাতুরতার মধ্যে স্বার্থপরতা নিহিত থাকে এবং শেষ ফয়সালা নিজেদের স্বার্থ ও কারণে হয়ে যায়। মোট কথা বুদ্ধি বিবেকের সম্পর্ক তাক্ওয়ার সাথে। এই বিষয়টি দুনিয়া এখনও বুঝতে পারেনি। কুরআন করীম যখন তাক্ওয়ার উপরে জোর দেয় তখন নির্বোধ মোল্লাতন্ত্রের উপরে জোর দেয় না বরং এমন তাক্ওয়ার উপরে জোর দেয় যার দ্বারা বিচক্ষণতার সৃষ্টি হয়। যার ফলে মু'মেন খোদার নূর দ্বারা দেখতে শুরু করে। সুবুদ্ধি ও তাক্ওয়া বস্তুতঃ এক বস্তুরই দুই নাম। প্রত্যেক ধরণের চাতুর্য যা তাক্ওয়াহীন তা অবশ্যই পরিণামে নিঃস্ফল হবে। একে চালাকি ও চাল্বাজী বলা যেতে পারে। সুবুদ্ধি বলা যেতে পারে না। সুতরাং আজ প্রাচ্যের দুনিয়া হোক বা পশ্চিমের দুনিয়া হোক উভয়েই সুবুদ্ধিহীন, কেননা তারা তাক্ওয়াবিহীন। হে আহ্মদী জামা'ত! তাক্ওয়ার দৌলতের আমীন (রক্ষাকারী) তোমাদিগকেই বানান হয়েছে। অতএব, এই আমানতের হক্ আদায় কর! যতক্ষণ তোমরা এই বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে, খোদাতা'লা ততদিন তোমাদিগকে প্রাধান্য দান করবেন এবং অসম্ভবকে সম্ভব বানাতে থাকবেন। আল্লাহ্তা'লা আমাদিগকে এর তৌফীক দান করুন আমীন।

—ঃসমাপ্তঃ—